Journal of Journalism and Media (2023), vol. 5, no. 1, pp. 104-118
DOI: https://doi.org/10.59185/jjm.v5i1.21

পণ্যায়নের বিরুদ্ধাচরণ ও চলচ্চিত্রে জনমানুষের স্থানঃ মার্কসবাদী সমালোচনামূলক সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে কামার আহমাদ সাইমনের 'শুনতে কি পাও!'

শিবলুল হক শোভন
বঙ্গবন্ধু তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

সার-সংক্ষেপ
কামার আহমাদ সাইমন পরিচালিত 'শুনতে কি পাও!' (২০১২) চলচ্চিত্রটিকে নির্মাণশৈলী, বিষয়বস্তু, ভাষারীতি ও বাস্তবতার উপস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিত থেকে মার্কসবাদী সমালোচনামূলক সাহিত্যতত্ত্বের নিরিখে ব্যাখ্যা করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। মুক্তির পর থেকেই চলচ্চিত্রটি নির্মাণশৈলী ও বিষয়বস্তুর কারণে আলোচিত। রাখী ও সৌমেন এর দাম্পত্য আখ্যানের সাথে আইলাতে বিধ্বস্ত জনজীবন চিত্রিত হয়েছে চলচ্চিত্রটিতে। দুর্যোগগ্রস্ত মানুষের পুনরুত্থানের প্রয়াস ও নিম্নবর্গীয় যাপনের উপস্থাপন এই চলচ্চিত্র আখ্যানের কেন্দ্রবিন্দু। চলচ্চিত্রের ভাষাগত ধ্রুপদী আয়োজন নির্ভর নির্মাণ কাঠামো এবং পুঁজিবাদী সাজসজ্জার পূজানির্ভর নির্মাণশৈলী থেকে বেরিয়ে সাইমনের নতুন বাস্তবতাড়িত প্রকৃত যাপনকে চিত্রায়িত করার যে প্রয়াস, তা চলচ্চিত্রটিতে উপস্থাপিত প্রান্তিক নিম্নবর্গের মানুষকে দেয় এক নতুন স্বর। আর এই প্রান্তিক গ্রামীণ মানুষের ভেতরকার যাতনার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও নব্য-সাম্রাজ্যবাদী আচরণও উঠে এসেছে প্রতীকীভাবে। গবেষণাকর্মটি গুনগতভাবে দেখতে চায় 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রটিতে মার্কসবাদী সমালোচনামূলক সাহিত্যতত্ত্বের নানা উপাদান কীভাবে মিশে আছে। গবেষণাকর্মটি 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্র, কামার আহমাদ সাইমনের সাক্ষাৎকার ও নানাবিধ মার্কসবাদী রচনাকে ভিত্তি করে লিখিত।

মূলশব্দ: চলচ্চিত্র ও পণ্যায়ন, চলচ্চিত্রের মার্কসবাদী সমালোচনা, শুনতে কি পাও!, পরিচালকের রোমান্টিসিজম, Epic Theatre ও চলচ্চিত্র।

প্রস্তাবনা

কামার আহমাদ সাইমন পরিচালিত ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র 'শুনতে কি পাও!'। আইলাতে বিপর্যস্ত একটি পরিবার– রাখী, সৌমেন ও তাদের সন্তান রাহুল। পারিবারিক সংকট, আনন্দ-বিষাদ ও খুনসুটির সমান্তরালে ঐ অঞ্চলের মানুষদের আইলা পরবর্তী জীবন সংগ্রামের সামষ্টিক আখ্যান চিত্রিত হয়েছে চলচ্চিত্রটিতে। নির্মাণশৈলীর দিক থেকে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত জাঁকজমকপূর্ণ যে রীতি, পরিচালক তা উপেক্ষা করে সাজসজ্জাবিহীন চলচ্চিত্র নির্মাণরীতি অনুসরণের প্রচেষ্টা চালান। গবেষণাকর্মটি চলচ্চিত্রে পরিচালকের পণ্যায়নের বিরুদ্ধে যে অবস্থান সেটি আলোচনায় আনবে। চলচ্চিত্রটিতে দুর্যোগগ্রস্তদের শুধুমাত্র দুর্ভোগের দিকগুলোই আসে নি, এসেছে আনন্দ, খুনসুটির দিকগুলোও। পরিচালকের রোমান্টিক ধারণা থেকে বের হয়ে আসা ও আখ্যান নির্মাণে নিম্নবর্গের চলচ্চিত্রে অংশগ্রহণের বিষয়টিও এই গবেষণায় উঠে এসেছে। জলবায়ু সমস্যার স্থানিক গৌণ কারণ অনুসন্ধান না করে পরিচালক মুখ্য বৈশ্বিক কারণকে ইঙ্গিতাকারে সামনে এনেছেন। চলচ্চিত্রটি সময়ের প্রতিনিধি হিসেবে কীভাবে এর ঐতিহাসিকতার সাথে সংযোগ ঘটিয়েছে? হেজিমনিকরণের প্রক্রিয়া ও আগ্রাসনের সম্মতিই বা কীভাবে উৎপাদিত হয়?– এসকল বিষয়ের অনুসন্ধান করা হয়েছে গবেষণাকর্মটিতে। 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রের ইতিহাসে বিচ্ছিন্ন কোনো চলচ্চিত্র নয়, এক্ষেত্রে রয়েছে দীর্ঘ পরম্পরাগত ধারা। সেই ধারার

Contact: Shiblul Haque Shuvon shhuvon@gmail.com

সাথে চলচ্চিত্রটির সংযোগ ও সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে এখানে। দুর্যোগ মানুষের সাময়িক শ্রেণিগত ঐক্য তৈরি করলেও শ্রেণিচেতনা মুছে ফেলতে পারে কি? সেই সূক্ষ্ম শ্রেণিচেতনা কি কামার আহমাদ সাইমন চিত্রায়িত করতে পেরেছেন তাঁর চলচ্চিত্রে? সেই প্রশ্নেরও অনুসন্ধান করা হয়েছে।

উনিশ শতকে মার্কস ও এঙ্গেলসের সমাজকাঠামোর বিশ্লেষণমূলক রচনার মধ্য দিয়েই মার্কসবাদী চিন্তার সূত্রপাত। মার্কসের পুঁজির আলোচনা শুরু হয়েছে 'পণ্যে'র ধারণাকে উন্মোচন করার মধ্য দিয়ে। মার্কস বলেছেন যে, "The wealth of societies in which the capitalist mode of production prevails appears as an 'immense collection of commodities'" (Marx, 1982, p. 125)| পণ্যায়নের এই ব্যবস্থা থেকে শিল্পও আলাদা থাকতে পারে না। শিল্পকেও নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বাজার ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত হতে হয়। শিল্প পরিণত হয় পণ্যে, শিল্পী পরিণত হয় শ্রমিকে। চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে বাজারের সাথে সম্পর্কটি আরো জোরালো। নির্মাণে বৃহৎ পুঁজি ব্যয় হওয়ায় মুনাফা বা নির্মাণের ব্যয় বাজার থেকে উঠে না আসলে নির্মাতার চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। শিল্পের এই পুঁজিনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে একে আরো স্বাধীন করে তোলার উদ্যোগ চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অনেকবার দেখা গিয়েছে। ফ্রেঞ্চ নিউ-ওয়েভ, ইতালিয়ান নব্য-বাস্তববাদ সেই চেষ্টার কতিপয় বৃহৎ আন্দোলন। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এই চেষ্টা প্রথম দেখা যায় 'স্টপ জেনোসাইড' (১৯৭১)-এ, যা ছিলো তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াইয়ের অংশ (Haq & Shoesmith, 2023)। পরিকল্পিত ও কাঠামোগতভাবে এর প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় মোরশেদুল ইসলামের 'আগামী' (১৯৮৪) চলচ্চিত্রে। এরপর তানভীর মোকাম্মেল নির্মাণ করেন 'হুলিয়া' (১৯৮৫)। মোস্তফা কামালের 'প্রত্যাবর্তন' (১৯৮৬), আবু সাইয়িদের 'আবর্তন' (১৯৮৯), তারেক মাসুদের 'আদম সুরত' (১৯৮৯), এনায়েত করিম বাবুলের 'চাক্কি' সেই ধারার চলচ্চিত্রের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এসকল চলচ্চিত্র তৎকালীন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFDC) নির্ভর কস্টিউমভিত্তিক ফ্যান্টাসি ও অ্যাকশন ফিল্মের ঘরানা থেকে বেরিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে চিত্রিত করার চেষ্টা করে। হক ও সুস্মিথ (২০২৩) এর মতে, বাজার থেকে মুনাফা তৈরি নয়, বরং এসব চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য ছিলো সমসাময়িক সময়ের সমাজ ও রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পর্দায় উপস্থাপন করা। চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রক্রিয়ার এই ধারাতেই কামার আহমাদ সাইমন 'শুনতে কি পাও!' নির্মাণ করেছেন যা তার চলচ্চিত্র নির্মাণরীতি ও বিষয় নির্বাচন থেকে উপলব্ধি করা যায়।

থিয়োডোর এডর্নোর[১] মতে, 'স্বাধীন' কাজগুলো অস্তিত্বশীল অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করার ক্ষমতা রাখে। সেই স্বাধীনতা গ্রহণের ফলেই চলচ্চিত্রটি চলমান নির্মাণরীতি ও ভাষার বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা দেখায়। রোজা লুক্সেমবার্গ[২] সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, প্রভাবশালী যে বুদ্ধিবৃত্তিক জগত বিদ্যমান, তা কখনোই শ্রমিক শ্রেণির হয়ে উঠতে পারে না। বরং এর বিপরীতে সেই প্রভাবশালী জগতকে স্থানান্তরিত করতে হবে শ্রমিক শ্রেণির সাহিত্যিক জগত, ভাবনার জগত দিয়ে। তাহলেই শ্রমিক শ্রেণির বক্তব্য ভাষা খুঁজে পাবে, প্রকাশিত হবে। আবার গস্কামসির[৩] কথা এই প্রসঙ্গে আরো প্রাসঙ্গিক, প্রভাবশালী শ্রেণির সৃষ্ট সাহিত্যিক জগত আচ্ছন্ন করে রাখে শ্রমিক শ্রেণিকে। প্রভাবশালী শ্রেণির সাহিত্যকে শ্রমিক শ্রেণি তাদের নিজেদের সাহিত্য ভাবতে থাকে। আধিপত্যবাদের সেই সূত্রটি কামার আহমাদ সাইমন চিত্রিত করেছেন এবং এর নির্মাণরীতির ভেতর বিপরীত সংস্কৃতি তৈরির প্রচেষ্টাও লক্ষণীয়। হাঙ্গেরিয়ান দার্শনিক গেয়র্গ লুকাচ[৪] বলেন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে সাহিত্যকে মূল্যায়ন করতে হবে। সাহিত্য তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রতিচ্ছবি, নৈব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে যা নানা ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের

সাথে মিলে যেতে পাওে, তবে সেই নির্দিষ্ট সময় ও ইতিহাসকে না জানলে সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক বিপর্যয় কোন সমাজবিচ্ছিন্ন ঐশ্বরিক অভিশাপ নয়। এটি বর্তমান বিশ্বে চলতে থাকা জলবায়ু রাজনীতিরই অংশ। 'শুনতে কি পাও!' সেই বিষয়টিকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছে। সাইমন 'শুনতে কি পাও!'-এ কোনোভাবেই চলচ্চিত্রের কাঠামো নিয়ে, শৈল্পিক বিভাজন নিয়ে চিন্তিত ছিলেন না। টেরি ঈসলটন[৫] এর মতে, সংজ্ঞা কোনো স্থির অবস্থান নয়। সাহিত্যের সংজ্ঞা সর্বদাই অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। ভাষা, আকৃতি, বক্তব্য ও নৈপুণ্যতা কোন সার্বজনীন ও ব্যক্তিনিরপেক্ষ বিষয় নয়, বরং ঐতিহাসিক ও সামাজিক। সাইমন সেই বিষয়ে সচেতন থেকে শৈল্পিক স্বাধীনতা নিয়ে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেছেন। আর এ জন্যই দর্শকদেরও চলচ্চিত্রটির শ্রেনিকরণের ক্ষেত্রে পড়তে হয় দ্বিধায়। সাইমন দর্শককে চলচ্চিত্রের যে আখ্যান, তাতে বিমোহিত হতে দেন নি, বরং ব্রেটল্ট ব্রেখটের[৬] এপিক থিয়েটারের ন্যায় চলচ্চিত্রের ভেতরেই দর্শককে জানান দিয়েছেন যে এটি 'চলচ্চিত্র'। জর্জ প্লেখানভ[৭]-এর মতে, শিল্পী শিল্প তৈরি করে সেখানে সামাজিক অসঙ্গতি তুলে ধরার মাধ্যমে সামাজিক উপযোগিতা তৈরি করবেন। এর মাধ্যমে শিল্পী সামাজিক যে সংগ্রাম, সেখানেও ভূমিকা রাখবেন। নির্মাণরীতির বিশেষত্বের ফলে চলচ্চিত্রটি সামাজিক অসঙ্গতি উপস্থাপনের যে ঘনিষ্ঠ আবেদন, তা তৈরি করতে সক্ষম। সাইমন চলচ্চিত্রে শেণিগত ঐক্য উপস্থাপনে যতোটা আগ্রহী, ভুক্তভোগীদের অন্তর্গত শ্রেণিদ্বন্দ্ব উপস্থাপনে ততোটা নন। শ্রেণিচেতনার সামগ্রিকতার অনুপস্থিতি আলোচ্য চলচ্চিত্রে লক্ষণীয়।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণাটি মার্কসবাদী সমালোচনামূলক সাহিত্যতত্ত্বের আলোকে রচিত। গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করে উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে মার্কসবাদের বিভিন্ন সমালোচনামূলক সাহিত্যতত্ত্ব নানা গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। থিয়োডোর এডর্নোর শিল্প মূল্যায়ন, রোজা লুক্সেমবার্গের শ্রমিক শ্রেণির বিপরীত শিল্প সৃষ্টির ধারণা, গেয়র্গ লুকাচের সাহিত্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটগত মূল্যায়ন, গ্রামসির হেজিমনি ধারণা, টেরি ঈগলটনের সাহিত্যের সংজ্ঞা বিষয়ক আলোচনা, ব্রেটল্ট ব্রেখটের এপিক থিয়েটার, জর্জ প্লেখানভের সাহিত্যের উপযোগিতা বিষয়ক ধারণা– এসকল বিষয়কে ভিত্তি করে গবেষণাকর্মটির মূল আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। গবেষণাকর্মটি দেখার চেষ্টা করেছে, 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রটিতে মার্কসবাদী সমালোচনামূলক সাহিত্যতত্ত্বের নানা উপাদান কীভাবে মিশে আছে। চলচ্চিত্রের পণ্যায়ন, পরিচালকের রোমান্টিক ভাবনা, শিল্পের ঐতিহাসিক সংযোগ, হেজিমনি ও আগ্রাসনের সম্মতি, 'শুনতে কি পাও!' এর চলচ্চিত্রিক পরম্পরাগত সংযোগ, শ্রেণিচেতনার চিত্রায়ণের মতো বিষয়গুলো এখানে আলোচিত হয়েছে।

মার্কসবাদী সমালোচনামূলক সাহিত্যতত্ত্ব ও 'শুনতে কি পাও!'

চলচ্চিত্রের পণ্যায়নের বিরুদ্ধে অবস্থান

'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রটি নির্মানের দিক থেকে প্রথাগত নির্মানসজ্জার[৮] যে আয়োজন, তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে। 'চলচ্চিত্র' শব্দটি বিশেষত ফিকশন চলচ্চিত্রের কথা মাথায় আসতেই কল্পনায় ভেসে আসে আলোকসজ্জায় সাজানো সেট ও জ্যামিতিক পরিমিতির আলোকে গৃহীত চিত্রসম্ভার, আর 'উপযুক্ত' রূপসজ্জা ও পোশাকে আবৃত চরিত্রসমূহ। কিন্তু এই চলচ্চিত্রে সেসব লক্ষ করা যায় না। কেননা, এসবের কোনোটিই চলচ্চিত্র হয়ে উঠবার জন্য অপরিহার্য নয়। দৃশ্য ও শব্দই চলচ্চিত্রের মৌলিক উপাদান। আর এর সাথে যুক্ত হয় এই দুটি উপাদানকে ব্যবহার করে বক্তব্য উপস্থাপন। আর সেই মৌলিক উপাদানগুলোই সাইমনের প্রধান হাতিয়ার। প্রধান দুই চরিত্র সৌমেন ও রাখী'র পোশাকের প্রতি আলাদা দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না, তাদের মুখাবয়বে নেই কোন রূপসজ্জার ছোঁয়া, তাদের দারিদ্র্য জর্জরিত নিবাস কিংবা সংলাপ বলার 'অশৈল্পিক' রীতি

কোনোটিই 'শিল্পনৈপুণ্যতা'য় পরিপূর্ণ নয়। এই যে জীবনকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা, এটাই সাইমনের দেখার চোখ। চরিত্ররা অভিনয় করেছেন তাদের নিজের চরিত্রেই, আর তাই তাদের কোন 'বিশেষ' অভিনয় করতে হয় নি, কোনো আলাদা পোশাক পরতে হয়নি, সংলাপ প্রক্ষেপণের কোনো আলাদা রীতি অনুসরণ করতে হয় নি। পরিচালককেও সেট সজ্জায় দৃশ্যকে পরিপাটি করে তুলতে হয় নি। রাখী-সৌমেনের জ্যামিতিক বিন্যাসহীন ঘরই চলচ্চিত্রের সেট। আলোর ব্যবহারে দৃশ্যকে জাঁকজমকময় করে উপস্থাপনের চাইতে সেটিকে দেখার উপযোগী করাই ছিলো সাইমনের চেষ্টা। সাইমন চলচ্চিত্রে কোন গল্পের অনুপ্রবেশ ঘটান নি, কিন্তু তাঁর সাজানো দৃশ্যগুলো একেকটি গল্পের রূপ নিয়েছে। নিজের কোন দর্শন, বিশ্বাস কুশিলবদের ওপর চাপিয়ে দেন নি, কিন্তু তাঁর চলচ্চিত্রটিকে সম্পাদনা করেছেন নিজের দর্শনবোধ দ্বারা তাড়িত হয়েই। যা তিনি গ্রহণ করেছেন সেই ভুক্তভোগী কুশিলবদের সঙ্গ থেকেই। চলচ্চিত্রটিকে পণ্যে পরিণত করবার প্রথাগত প্রয়াস তাঁর ভেতরে পাওয়া যায় না। কোনো চটকদার গল্প, তারকা অভিনেতা, চাপিয়ে দেওয়া দর্শন বা অপ্রয়োজনীয় জ্যামিতিক নান্দনিক দৃশ্য, কোনোটিরই উপস্থিতি দেখা যায় না এখানে। এ ব্যাপারে যে সাইমন সচেতন ছিলেন তা তাঁর বক্তব্যতেও উপলব্ধি করা যায়। সাইমন উদাহরণ দিয়ে বলেন:

> একটি জায়গায় দেখবেন যে রাখী বৃষ্টিতে গোসল করছে এবং গোসল করার সময় চুল এলিয়ে দিচ্ছে, ক্যামেরার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও (রাখী) কিন্তু ক্যামেরার সামনে অবজেক্টিফাই ওমেন ফিগার হিসেবে আসে নি। তার কারণ হচ্ছে, ক্যামেরাম্যান ও চরিত্র, দুই জনই কিন্তু খুব কেয়ারফুল ছিলো ব্যাপারটায়। ক্যামেরাম্যান কিন্তু তখনই মুভ করছে যখন এ (চরিত্র) চাচ্ছে যে আমার ছবি তুলুক। এটা যখন হচ্ছে তখন কিন্তু ক্যামেরাটা কাজ করছে। এটা তখনই অবজেক্টিফাইড হতো যদি আমি ঘরের ভেতর থেকে সরাসরি ফেইসে না নিয়ে, প্রোফাইলে রেখে, তার বডিটা ফিচারে রেখে যদি ছবিটা তুলতাম। (Jahangirnagar Cine Society, 2020, 1:08:42)

সুতরাং পরিচালক তাঁর চলচ্চিত্রের পণ্য না হয়ে ওঠার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। এছাড়া চলচ্চিত্রজুড়ে হ্যান্ডহ্যান্ড শটের ব্যবহার, চিত্রগ্রহণে কোমলতার চাইতে রুক্ষতার আধিক্য 'শুনতে কি পাও!' এর বিষয়ের সাথে ছিল অধিক মানানসই। এমনকি তাঁর চলচ্চিত্রের পোস্টারেও প্রথাগত যে গাম্ভীর্যময়তা ও বিমূর্ততা, তা থেকে বেরিয়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত রিক্সা পেইন্টিং এর ধারাকে অনুসরণ করা হয়েছে। যা দেখামাত্রই নিম্নবর্গের মানুষের তাদের নিজেদের জগতের বহুল পরিচিত উপাদান বলে মনে হবে। থিয়োডোর এডর্নোর মতে, "while popular art forms are forced to collude with the economic system which shapes them, 'autonomous' works have the power to 'negate' the reality to which they relate" (Selden, 1993, p. 82)। 'শুনতে কি পাও!' অস্তিত্বশীল অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্ট যে চলচ্চিত্র নির্মাণরীতি, তা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেছে, যার উদাহরণ এই চলচ্চিত্রের আখ্যান, চিত্রগ্রহণ, সেট ডিজাইন, রূপসজ্জা, সংলাপ ও পোস্টার ডিজাইনে স্পষ্ট দেখা যায়। অস্তিত্বশীল অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্ট বাস্তবতাকে অস্বীকার করে, পণ্যায়নের বিরুদ্ধাচরণের আপসহীন মনোভাব চলচ্চিত্রটির এই বিশেষ নির্মাণরীতিকে উদ্দীপ্ত করেছে। এর ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণ বলতেই যে পুঁজির পদচুম্বনের ধারণা এবং এক রহস্যময় অতিমানবীয় কর্মময়তার চিন্তা, তা থেকেও সাইমন অনেক নতুন উদ্যমী নির্মাতাদের কিছুটা মুক্তি দিতে পেরেছেন।

রোমান্টিসিজম থেকে মুক্তি ও নিম্নবর্গের সাহিত্যরচনা

নির্মাতা চরিত্রদের সম্পর্কে কোন পূর্ব অবস্থান ও সুলিখিত চিত্রনাট্য দিয়ে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করতে যান নি। দুর্যোগ কবলিত মানুষদের নিয়ে রোমান্টিক দুঃখের ধারণা থেকেও তিনি বের হয়ে এসেছেন। সুতারখালী গ্রামে গিয়েই তিনি নির্ধারণ করেছেন তাঁর কুশিলবদের। চিত্রনাট্যের একটি খসড়া তৈরি করে তা সুতারখালী গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে যাপনের মধ্য দিয়ে তাকে পরিপূর্ণ করেছেন (Jahangirnagar Cine Society, 2020, 19:43)। গ্রামবাসীদের বক্তব্যকেই তিনি ধারণ করেছেন। সেই বক্তব্যগুলোকে সাজিয়েছেন নিজের মতো করে।

আর তাই পরিচালক তাঁর নিজের কোনো আদর্শ, বিশ্বাস, বোধ বা বক্তব্য তাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। তাদের জীবনের যে স্বাভাবিক যাপন, সেটিই সাইমন উপস্থাপন করেছেন। এজন্যই আমরা সুখ-দুঃখের কোন একটির বাইনারি উপস্থাপনের বদলে দুটি বিষয়েরই সহাবস্থান দেখতে পাই। রাখী বিশুদ্ধ পানির জন্য লাইনে দাঁড়াচ্ছে, সৌমেন ত্রাণ নিয়ে হুড়োহুড়ি করছে, কিন্তু এই সংগ্রামমুখর জীবনই তাদের একমাত্র যাপন না। পরিচালক দেখাচ্ছেন মোবাইল ফোনকে কেন্দ্র করে রাখী-সৌমেনের রাগ-অভিমানকেও দেখাচ্ছেন। অন্যদিকে, চায়ের দোকানের আলাপে যখন কমিশনারের পাশে বসে থাকা লোকটির উদ্দেশ্যে সৌমেন বলে ওঠে, "গ্লাসটা ভাইঙ্গে ফেলতি পারেন না!" (Simon, 2012, 27:53), তখন তা সেই অঞ্চলের মানুষদের দুঃখ যাতনার ক্ষোভেরই প্রতিফলন। কিন্তু পরিচালক সৌমেনকে কোন বিপ্লবী চরিত্রে পরিণত করেন নি। বরং বাঁধ নির্মাণের সময়কালে আমরা দেখতে পাই যে, সৌমেন চেয়ারম্যানের সাহচর্যে থাকা লোকদেরই একজন। বাঁধাধরা নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ও ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা চরিত্র হিসেবেই সৌমেন উপস্থাপিত হয়েছে। আবার, রাখী ঘরে গৃহস্থালির কাজ করে, পানি আনতে লাইনে দাঁড়ায়, এনজিও স্কুলে পাঠদান করে– এই সংগ্রামী জীবনই তার শেষ কথা নয়। আমরা দেখি যে, রাখী গ্রামীণ বধূদের সাথে ফোড়ন কাটা ও খুনসুটিতে অংশগ্রহণ করছে। এই সংগ্রামমুখর জীবনের সাথেই রয়েছে তাদের হাসি-ঠাট্টা-খুনসুটি-রাগ-অভিমানের নানা উপাদান। দুর্যোগকালীন সময়ে নিম্নবিত্ত মানুষদের নিয়ে সুখ ও দুঃখের যে বাইনারি ধারণা বিদ্যমান, তা থেকে বেরিয়ে সাইমন যেরূপ সচেতনতা অবলম্বন করেছেন তা সেই অঞ্চলের মানুষের নিজেদের কথা বলার এক উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছে। আর প্রথাগত চরিত্র থেকে এই দূরত্ব বজায় রেখে চলায় তাঁর ভুক্তভোগী কুশিলবরা পেয়েছে নিজস্ব স্বর।

আলোকচিত্র ১. 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রের পোস্টার; উৎস: (বিজয় দিবসে সাইমনের বহুল আলোচিত ছবি 'শুনতে কি পাও!, ২০২০)

আলোকচিত্র ২: 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রে রাখীর বৃষ্টিতে ভেজা ও চুল এলিয়ে দেওয়ার দৃশ্য ; উৎস: (Simon, 2012)

আলোকচিত্র ৩: সঙ্গী গৃহবধূদের সাথে রাখীর ফোড়ন কাটা ও খুনসুটি; উৎস: (Simon, 2012)

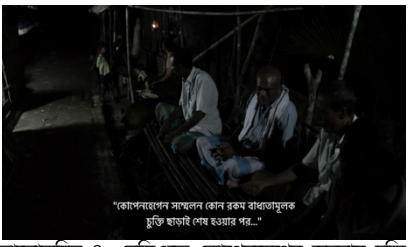

আলোকচিত্র ৪: রেডিওতে কোপেনহেগেন জলবায়ু চুক্তি নিয়ে খবর শুনছে গ্রামবাসী; উৎস: (Simon, 2012)

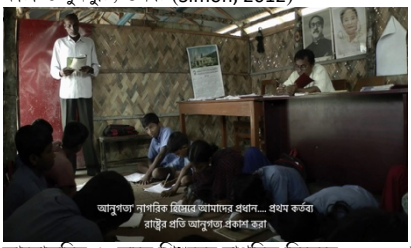

আলোকচিত্র ৫: স্কুলে শিশুদের নাগরিক হিসেবে আনুগত্যের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে; উৎস: (Simon, 2012)

আলোকচিত্র ৬: 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে রাহুলের সাথে ক্যামেরার অন্তরালের কারো কথোপকথন; উৎস: (Simon, 2012)

রোজা লুক্সেমবার্গ বলেন, "a working-class culture could not be produced within a bourgeois economic framework, and that the workers could only advance if they created for themselves the necessary intellectual weapons in their struggle for liberation" (Habib, 2005, p. 538)।

অর্থাৎ, শ্রমিক শ্রেণির মনোভাব কখনোই পুঁজিপতির প্রভাবশালী শিল্পকর্মে পাওয়া যাবে না। সেই শিল্পকলা পুঁজিপতিদেরই উদ্দেশ্য ও মনোভাবের প্রতিনিধিত্ব করবে। তার বিপরীতে শ্রমিক শ্রেণির নিজেদের শৈল্পিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগত তৈরি করতে হবে। প্রভাবশালী যে বুদ্ধিবৃত্তির জগত বিদ্যমান তা কখনোই শ্রমিক শ্রেণির হয়ে উঠতে পারে না। বরং এর বিপরীতে সেই প্রভাবশালী জগতকে স্থানান্তরিত করতে হবে শ্রমিক শ্রেণির শৈল্পিক জগত, ভাবনার জগত দিয়ে। তবেই শ্রমিক শ্রেণির কথা ভাষা খুঁজে পাবে, প্রকাশিত হবে। সাইমন অর্থনৈতিকভাবে নিম্নবর্গ বা শ্রমিক শ্রেণির প্রতিনিধি নন। কিন্তু তাঁর চিত্রায়ণের কৌশল পর্যবেক্ষণমূলক (Observatory), যা নিম্নবর্গের মানুষদের ওপর পরিচালকের ধারণা আরোপনের স্থলে তাঁকে চিত্রিত নিম্নবর্গের মানুষের জীবনদৃশ্যের সম্পাদকে পরিণত করেছে। পরিচালক একাই চিত্রনাট্য নির্মাতা নন, অংশগ্রহণকারী গ্রামবাসীও সেই রচনাকর্মের অংশ। অর্থাৎ, চিত্রিত গ্রামবাসী শুধুমাত্র পরিচালকের ক্রীড়নক নন, তারাও নির্মাণ প্রক্রিয়ার অংশ। পরিচালক বরং তাদের জীবন থেকে আখ্যান সংগ্রহ করেছেন। নির্মাতা এখানে দৃশ্য রচয়িতার চাইতেও অনেক বেশি দৃশ্য সংগ্রাহকের ভূমিকা পালন করেছেন। নির্মাণের এই রীতির কারণে চিত্রিত গ্রামবাসীর ক্রিয়াকর্ম ও পরিচালকের দৃশ্য নির্বাচনের মাঝে একধরণের বোঝাপড়া বা Negotiation-এর ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়, যা পরিচালক-চিত্রিতের যে কেন্দ্র-প্রান্তের ধারণা তা ভেঙে দিয়ে এক ধরনের বাইনারি পরিস্থিতি তৈরি করে। যার প্রভাব চলচ্চিত্রেও দেখা যায়। আর নির্মাণের এই প্রণালী পরিচালকের সাথে সাথে নিম্নবর্গের মানুষদেরও নির্মাতায়

পরিণত করে যা, রোজার আকাঙ্ক্ষিত শ্রমিক শ্রেণির সাহিত্যসৃষ্টির যে তাগিদ, তাতে নিঃসন্দেহে পদ্ধতিগত অবদান রাখে।

সময়ের প্রতিনিধিত্ব ও ঐতিহাসিক সংযুক্ততা

শিল্প যা উপস্থাপন কওে, তার চাইতেও অধিক আলোকপাত করে যা সেখানে গোপন করা হয়, উহ্য রাখা হয় তার প্রতি। 'শুনতে কি পাও!' এর মূল উপজীব্য আইলাতে বিপর্যস্ত সুতারখালী গ্রামের মানুষদের সংগ্রাম হলেও, এর পেছনের যে মূল কারণ, তা এখানে অনেকটাই কম উপস্থাপিত হয়েছে। তবে পরিচালক সেদিকে নানাভাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন। চলচ্চিত্রের একটি দৃশ্যে দেখা যায়, গ্রামবাসী রেডিওতে কোপেনহেগেন জলবায়ু চুক্তি ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া নিয়ে চীন ও ব্রিটেনের দ্বন্দ্বের খবর শুনছে। মূলত চলচ্চিত্রের দর্শকদের বলে দেওয়া হচ্ছে এই বিপর্যয়ের অন্তর্নিহিত কারণ। অত্যধিক কার্বন নিঃসরণের ফলে আর্কটিকের বরফ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়ছে আর অতিদ্রুত ক্ষয় হচ্ছে অতিবেগুনী রশ্মি থেকে পৃথিবীকে রক্ষাকারী ওজোনস্তর। এই মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের পেছনে সবচেয়ে বেশি দায় শিল্পোন্নত দেশগুলোর। কিন্তু কম কার্বন নিঃসরণ করেও এই বিপর্যয়ের মারাত্মক ফল ভোগ করতে হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে। 'শুনতে কি পাও!' এই জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে কঠিন জীবন সংগ্রামে পতিত হওয়া একটি পরিবারের আখ্যান, যার মধ্য দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনের যে প্রভাব তা হাজির করা হয়েছে। গেয়র্গ লুকাচ-এর মতে:

> Achilles, and Werther, Oedipus and Tom Jones, Antigone and Anna Karenina: their individual existence…cannot be distinguished from their social and historical environment. Their human significance, their specific individuality cannot be separated from the context in which they were created. (Eagleton, 1996, p. 143)

লুকাচ মনে করতেন, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে সাহিত্যকে মূল্যায়ন করতে হবে। সাহিত্য তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের প্রতিচ্ছবি। নৈব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলো নানা ঘটনা ও প্রেক্ষাপটের সাথে মিলে যেতে পারে, তবে সেই নির্দিষ্ট সময় ও ইতিহাসকে না জানলে কোনো সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়। 'শুনতে কি পাও!'-এর কাহিনীর সাথে সাথে যখন এর পেছনের জলবায়ু রাজনীতির প্রেক্ষাপটও জানা যায়, তখনই চলচ্চিত্রটি আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে, আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে, ভুক্তভোগীদের বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসে। যারা হয়তো এই কার্বন নিঃসরণের তথ্য-উপাত্ত ও এর পেছনের রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞাত, কিন্তু তাদেরই করতে হচ্ছে এই বিপর্যয়ের ফলভোগ। আর এজন্যই যেন পরিচালক চলচ্চিত্রটির নামের মধ্য দিয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান দিতে চাইছেন এই মানুষগুলোর দুঃখের কথা, তাদের এই প্রতিকূল জীবনের কথা। যে মানুষগুলোর শক্তি নেই জাতিসংঘ বা কোন বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে এই কথাগুলো উপস্থাপনের, তাদের প্রতিনিধি হয়েই যেন সাইমন আহ্বান করছেন সবাইকে, আর বিস্ময় নিয়ে বলেছেন, 'শুনতে কি পাও!'।

হেজিমনি ও আধিপত্যের সম্মতি

সকল প্রাণিই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতিকে জয় করেই তাকে টিকে থাকতে হয়। মানুষ সেই দৌড়ে থাকে সবার আগে। কিন্তু প্রকৃতির উপর এই আঘাত হওয়া উচিত প্রয়োজনের সাপেক্ষে। অহেতুক প্রয়োজন ও বিকল্প থাকা সত্ত্বেও যদি প্রকৃতির বিনাশ করা হয়, তখন জীববৈচিত্র্যের স্বাভাবিক চক্র নষ্ট হয়। যে গ্রামীণ মানুষের কথা আমরা 'শুনতে কি পাও!'

চলচ্চিত্রে বা বাস্তব প্রেক্ষাপটে দেখতে পাই, তারা অধিকাংশই রাষ্ট্রযন্ত্র ও আধিপত্যশীল গোষ্ঠীর কাঠামোগত উন্নয়নের রাজনীতি দ্বারা 'হেজিমনাইজড'। রাষ্ট্রযন্ত্র কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন নাগরিকদের পরোক্ষ সম্মতি দ্বারাই সম্পন্ন হয়, তা প্রকৃতি ও বাস্তুসংস্থানের জন্য হুমকিস্বরূপ হলেও। এর একটি উদাহরণ বাংলাদেশের রামপাল কয়লাভিত্তিক

তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পটি, যা সুন্দরবন থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে স্থাপিত হয়েছে (Islam & Al-Amin, 2019)। এমন হঠকারী সিদ্ধান্তের জন্য রাষ্টপরিচালনাকারী ক্ষমতাসীনদের দোষারোপ করা উচিত, কিন্তু নাগরিক অসচেতনতার দায় বুঝতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে গ্রামসির কাছে। রাষ্ট্রযন্ত্রের এই আচরণের মৃদু প্রতীকী উপস্থাপন দেখা যায় 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রে। চায়ের দোকানে বাকবিতণ্ডা ও কমিশনার-গ্রামবাসীর উত্তেজনাপূর্ণ বাকবিনিময়ের পরের দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে স্কুলে শিশু শিক্ষার্থীদের রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকার শিক্ষা দেয়া হচ্ছে এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও উন্নয়নের জন্য এর আবশ্যক প্রয়োজনীয়তা বয়ান করা হচ্ছে। আদর্শের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে গ্রামসি বলেন, "'spontaneous' consent given by the great masses of the population to the general; direction imposed on social life by the domination fundamental group" (Crehan, 2002, p. 102)। গ্রামসির মতে, প্রভাবশালী শ্রেণির সৃষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগত আচ্ছন্ন করে রাখে শ্রমিক শ্রেণিকেও। প্রভাবশালী শ্রেণির সংস্কৃতিকে শ্রমিক শ্রেণি তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ভাবতে থাকে। পুঁজিবাদী সমাজে রাষ্ট্র পুঁজিপতিদের অস্তিত্বকে প্রাধান্য দিয়ে টিকিয়ে রাখে। অর্থনৈতিকভাবে প্রধান তথা পুঁজিপতি শ্রেণিটি সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে মিত্রতা তৈরি ও অক্ষুন্ন রাখার মাধ্যমে অন্যান্য শ্রেণির ওপর এক ধরনের সাংস্কৃতিক আচ্ছন্নতা তৈরি করে। স্কুলে শিশু শিক্ষার্থীদের যে আনুগত্যের পাঠদান তা রাষ্ট্র ও পুঁজিপতিদের আনুকূল্যে সম্মতি উৎপাদনেরই সংস্কৃতি। অসহনীয় দুর্ভোগ, ত্রাণ বিতরণে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার পরেও গ্রামবাসীর রাষ্ট্রের ওপর চড়াও না হওয়ার যে মনস্তত্ত্ব, সাইমন তার উপস্থাপন ঘটয়েছেন প্রতীকীভাবে।

চলচ্চিত্রে মার্কসবাদের প্রভাব ও 'শুনতে কি পাও!' এর পরম্পরাগত সংযোগ

চলচ্চিত্রটির জন্য পরিচালক যে ভাষার ব্যবহার করেছেন, এ পর্যায়ে সেদিকে আলোকপাত করা যেতে পারে। সচরাচর যে 'জনরা' (Genre) ভিত্তিক চলচ্চিত্র দেখতে আমরা অভ্যস্ত, এক্ষেত্রে পরিচালক আমাদেরকে তার বাইরে এনে ফেলেন। এই চলচ্চিত্রটি কল্পচিত্র (Fiction) নাকি প্রামাণ্যচিত্র (Documentary), সে বিভাজন করে ওঠা যায় না। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এরূপ ভাষার ব্যবহারের রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস, যার পরম্পরায় সাইমনের এই প্রচেষ্টা। ইতালিয়ান নব্য-বাস্তববাদী[১০] ধারায় ভিত্তোরিও ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিভস' (১৯৪৮) বা ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভে ফ্রাসোয়া[১১] ত্রুফো'র 'দ্য ফোর হান্ড্রেড ব্লোজ' (১৯৫৯) বা গদারের 'ব্রেথলেস' (১৯৬০) প্রভৃতি চলচ্চিত্র তৎকালীন স্টুডিওনির্ভর চলচ্চিত্রায়নের যে কৃত্রিম ধারা, তা ভেঙে নতুন এক ধারা তৈরি কওে, যেখানে শুরু হয় অপেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয়, আলোকসজ্জায় প্রাকৃতিক আলোর ব্যবহার, Digetic Sound-এর সাথে Non-digetic Sound-এর ব্যবহার ইত্যাদি; ফলে চলচ্চিত্র নির্মাণের রীতিতে আমূল বিপ্লব নেমে আসে। দর্শনগত দিক থেকে মার্কসবাদের প্রভাব দেখা যায় এই সময়ের চলচ্চিত্রগুলোতে। বিষয়বস্তুর দিক থেকেও নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবন ও সংকটকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। চলচ্চিত্র নির্মাণ কিছুটা সহজ হয়ে ওঠে, যা ছিল পণ্যায়নের হাত থেকে প্রথম দফায় স্বাধীন শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। চলচ্চিত্রের নির্মাণশৈলীকে আদর্শগত

ও রাজনৈতিক হিসেবে ব্যাখ্যা করে 'perfection' এর যে ধারণা, Third Cinema[১২] সেটিকে ইউরোপকেন্দ্রিক ও পুঁজিবাদী আদর্শের নির্মাণ বলে আখ্যা দেয়। এর বিপরীতে Third Cinema দেখায় যে, তৃতীয় বিশ্বের চলচ্চিত্রের নির্মাণশৈলী হতে পারে 'imperfect', যা অনভিজ্ঞ কলাকুশলী, হ্যান্ড-হেল্ড শট, সহজলভ্য আলোর ব্যবহার, সম্পাদনার ক্ষেত্রে সুচিন্তিত দৃশ্য নির্বাচনের চাইতে অর্থবহ প্রয়োজনীয় দৃশ্য ও রং বিন্যাসে বাস্তবিক রং ব্যবহার ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হবে (Gabriel, 1979)। 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রের নির্মাণরীতির ক্ষেত্রে এসকল চলচ্চিত্র আন্দোলনের নির্মাণকৌশল প্রভাব বিস্তার করেছে। হ্যান্ডহেল্ড শট, প্রাকৃতিক আলো, অনভিজ্ঞ-অপেশাদার অভিনয়শিল্পী, বাস্তবিক রং, দৃশ্যের জ্যামিতিক ফ্রেমিং-এর চাইতে অর্থবহ দৃশ্যধারণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য চলচ্চিত্রটিতে দেখা যায়, যা উক্ত চলচ্চিত্র আন্দোলনগুলোর দর্শনের সাথে চলচ্চিত্রটিকে সমান্তরালে দাঁড় করায়।

কিন্তু উল্লিখিত আন্দোলনসমূহ চলচ্চিত্রে নির্মাণরীতি ও কৌশলের দিক থেকে পরিবর্তন ঘটালেও ভাষাকাঠামোতে অধিকাংশই ছিল কল্পচিত্র। ইরানিয়ান নিউ ওয়েভের দ্বিতীয় ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মাঝে আমরা দেখতে পাই চলচ্চিত্র ভাষাকাঠামোর এক দোদুল্যমান রীতি। নির্মাণরীতির দিক থেকে এই ধারার চলচ্চিত্র নির্মাতারা ইতালিয়ান নব্য-বাস্তববাদ ও ফরাসি নিউ ওয়েভ দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। আর এর সাথে তাঁরা যোগ করেন নিজেদের নতুন ভাষারীতি। আব্বাস কিয়োরাস্তামির কোকার ট্রিলজি (১৯৮৭, ১৯৯২, ১৯৯৪), ক্লোজ-আপ (১৯৯০), টেন (২০০২) প্রভৃতি চলচ্চিত্রগুলো চলচ্চিত্র ইতিহাসের ভাষার যুগ পরিবর্তনকারী নিরীক্ষাধর্মী কাজ। চলচ্চিত্রগুলো দর্শককে কল্পনা ও বাস্তবতার এক মিশ্র জগতে টেনে নিয়ে যায়। এই কাজগুলো প্রথাগত প্রামাণ্যচিত্রের ভাবনা থেকে এবং কল্পচিত্রের রেখা থেকে বহুদূরে এক স্বতন্ত্র সীমানায় অবস্থান করে। এই রীতিতেই পরবর্তীকালে জাফর পানাহি নির্মাণ করেন 'অফসাইড' (২০০৬)। ভাষারীতির ক্ষেত্রে এই ধারাতেই এগিয়েছেন কামার আহমাদ সাইমন। তাঁর চলচ্চিত্রে প্রথাগত নির্মাণরীতি বা ভাষারীতি কোনোটিই অনুসরণ করা হয় নি। চলচ্চিত্রের কোন নির্দিষ্ট আঙ্গিকে একে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। তাই এটি প্রামাণ্যচিত্র নাকি কল্পচিত্র, দর্শকদের চলচ্চিত্রটির শ্রেণিকরণে এমন দ্বিধায় পড়তে হয়। তবে এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ও ব্যক্তির মূল্যবোধের সাথে জড়িয়ে আছে সামাজিক মতাদর্শ ও ক্ষমতা। এই দ্বন্দ্ব নিয়ে সাহিত্যের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে টেরি ঈগলটন বলেন:

> Literature does not exist in the sense that insects do, and that the value-judgements by which it is constituted are historically variable, but that these value-judgements themselves have a close relation to social ideologies. They refer in the end not simply to private taste, but to the assumptions by which certain social groups exercise and maintain power over others. (Eagleton, 2008, p. 14)

সাহিত্যের কোনো সংজ্ঞাই স্থির বা সার্বজনীন নয়। এই সংজ্ঞায়ন সামাজিক ও ঐতিহাসিকভাবে নির্মিত হচ্ছে। এর সাথে সামাজিক মতাদর্শের সম্পর্কও রয়েছে। শুধুমাত্র ব্যক্তি রুচিই নয় বরং পরিশেষে এটি হয়ে দাঁড়ায় সামাজিক দলগুলোর ক্ষমতা চর্চা ও প্রয়োগের একটি ক্ষেত্র। সুতরাং সাহিত্যিক স্বীকৃতি মূলত একটি ঐতিহাসিক ও সামাজিক নির্মাণ প্রক্রিয়া। একইভাবে, কামার আহমাদ সাইমনের 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রটি কল্পচিত্র নাকি প্রামাণচিত্র, সেই নির্ধারণ প্রক্রিয়াটিও সামাজিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক। এটিকে কল্পচিত্র বলার মধ্য দিয়ে এর অন্তর্নিহিত যে বাস্তবতা সেটিকে অস্বীকার করা হবে। আবার প্রামাণ্যচিত্র বলার মধ্য দিয়ে এর

যে স্বতন্ত্র আখ্যানমূলক নির্মাণপ্রক্রিয়া, চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত ঘটনায় পরিচালকের সংযোগ ও নির্দেশনা– সেগুলোকে অগ্রাহ্য করা হবে। আর এই দুইয়ের সাথেই দর্শকের রাজনৈতিক অবস্থান জড়িত। আন্তর্জাতিক অঙ্গণে চলচ্চিত্রটি পুরস্কার অর্জন করেছে প্রামাণ্যচিত্র হিসেবে, কিন্তু এই বিষয়টি আমরা আলোচনার বাইরে রাখতে চাই। কেননা, কোন চলচ্চিত্র উৎসব বা প্রতিযোগিতায় চলচ্চিত্রটি জমাদানের ক্ষেত্রে পরিচালক বা প্রযোজককে নির্দিষ্ট করে দিতে হয় যে সে কোন ক্যাটাগরিতে তা জমা দিবেন। কিন্তু যখন পরিচালক এই সংজ্ঞায়নের ব্যাপারে নীরব থেকেছেন, তখন তা নির্ধারিত হবে দর্শকদের সামাজিক-ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক অবস্থানের মাধ্যমে। সুতরাং সাইমন শিল্পের রীতির সংজ্ঞার নমনীয় অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। আর তাই চলচ্চিত্রটির অবস্থান কোন শাখায় (Genre) পড়বে তা নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন না এবং বিতর্কেও জড়ান নি। শিল্প যে কোন বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলে না, বরং স্বাধীনতার পূর্ণ প্রয়োগ করে, তাই তিনি দেখিয়েছেন 'শুনতে কি পাও!' এর নির্মাণরীতিতে।

দর্শকের দায়বোধ জাগরণ ও সামাজিক উপযোগিতা

চলচ্চিত্রটিতে একটি দৃশ্যে চলচ্চিত্র ও দর্শকের মধ্যকার দেয়াল ভাঙার কাজ করেছেন, যা নাট্যকার ব্রের্টল্ট ব্রেখট এর 'Epic Theatre' এর ভাবনার প্রতিফলন। ব্রেখট এর 'Epic Theatre' এর ধারণাটি ছিল নিম্নরূপ:

> The play itself, far from forming an organic unity which carries an audience hypnotically through from beginning to end, is formally uneven, interrupted, discontinuous, juxtaposing its scenes in ways which disrupt conventional expectations and force the audience into critical speculation on the dialectical relations between the episodes. (Eagleton, 2006, p. 31)

চলচ্চিত্রের গল্পের সাথে, যাপনের সাথে একাত্ম হয়ে দর্শক যেন ভুলে না যায় যে এটি বাস্তব সত্য, সেই প্রচেষ্টা সাইমনের মাঝেও দেখা যায়। যেন তিনি দর্শককে জানান দিতে চাইছেন যে এটি কোন কল্পকাহিনী নয়, বরং বাস্তব সত্য। পরিচালক শুধু মুহূর্তগুলো ধারণ করছেন। চলচ্চিত্রের ১ ঘণ্টা ১৪ মিনিট-এ দেখা যায় রাহুল চতুর্থ দেয়াল ভেঙে দর্শকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, "তোমগো বাড়ি কোন জায়গায়? কও!" (Kamar, 2012)। সেই দৃশ্যে ক্যামেরার পেছনে থাকা লোকটির সাথে রাহুলের কথোপকথন হয়। এমনকি কথোপকথনের এক পর্যায়ে রাহুল বলে ওঠে, "আমি যাবো ওগো বাড়ি। এমা! মা! বড় হলি...এই ক্যামেরা চালান লোকগো...বাড়ি না!" ক্যামেরা ওয়ালা বলে সম্মোধন করায় মা ছেলেকে ধমকে বলে উঠে, "অ্যাই! কাকু...!" রাহুলের কথোপকথনের একটি বড় অংশ জুড়ে সেই ক্যামেরাম্যানের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা। পরে দেখা যায় রাহুল ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে, ক্যামেরাম্যানের বাড়ি কোনদিকে। আর কিছুক্ষণ পর রাহুল ভুম ভুম স্বর তুলে তার খেলনা বাহন নিয়ে পর্দার দিকে যাত্রা করে এবং ক্যামেরা ঘুরে রাহুলের পেছন থেকে চলে যাওয়া দেখায় (Simon, 2012)।

রাহুলের এই প্রশ্নগুলো শিশুতোষ হলেও পরিচালকের উদ্দেশ্যকে আমরা শিশুতোষ বলতে পারি না। স্পষ্টতই ব্রেখটীয় দর্শনের প্রভাব সাইমনের পরিচালনায় দেখা যায়। রাহুল যেন দর্শকের দিকেই প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে যে, তোমাদের বাড়ি কোথায়? আর তার খেলনা বাহন নিয়ে দর্শকদের বাড়ির দিকে যাত্রা করছে। কেননা, দুর্যোগগ্রস্ত রাহুল শৈশব থেকেই দেখছে যে তাদের 'বাড়ি' বলতে যা বোঝায় তা নেই। আর এই না থাকায় সমাজ, রাষ্ট্র, বৈশ্বিক রাজনীতি ও নাগরিকদের

দায় রয়েছে। তাই চলচ্চিত্রের চতুর্থ দেয়াল ভেঙে সেই দায়টিই মনে করিয়ে দিতে চাইছেন কামার আহমাদ সাইমন। এটি কোন মনোরম কল্পকাহিনী নয়, বরং দুঃসহনীয় বাস্তবতা।

সাইমন চলচ্চিত্রের শেষভাগে এই ভুক্তভোগী ও অবহেলায় নিপীড়িত মানুষদের দুঃখের উপস্থাপনকে আরো কিছুটা বাড়িয়ে তুলেছেন। রাখী-সৌমেন অবশেষে তাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত নিজেদের বাড়িতে উঠতে পারলো, কিন্তু তখন আবারও আরেকটি ঝড় চারিদিক অশান্ত করে তুলছে। আবার বৃষ্টির অঝর ধারা। হয়তো আবারও কোন বিপর্যয় কিংবা দুর্দশা। পরিচালক দর্শককে বুঝিয়ে দেন যে, এই গল্পের কোন শেষ নেই। জর্জ প্লেখানভ-এর ভাষায় বলতে হয়:

> The utilitarian attitude, which grants art a function in social struggles as well as the power of judgment concerning the real world, arises and becomes stronger wherever a mutual sympathy exists between the individuals . . . interested in artistic creation and some considerable part of society. (Habib, 537, p. 2005)

শিল্পী শিল্প তৈরি করে সেখানে সামাজিক অসঙ্গতি উপস্থাপনের মাধ্যমে সামাজিক উপযোগিতা তৈরি করবেন। এর মাধ্যমে শিল্পী সামাজিক যে সংগ্রাম, সেখানেও ভূমিকা রাখবেন। কামার আহমাদ সাইমন তাঁর এই চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে আইলায় বিধ্বস্ত মানুষের জীবন সংগ্রামকে পর্দায় স্থান দিয়েছেন। সে জীবন মসৃণ কোন জীবন নয়, যার প্রতি পদক্ষেপে রয়েছে পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাব ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অবহেলা। বিশুদ্ধ পানির সংকট, খাবার ও ত্রাণের অপর্যাপ্ততা বা বাঁধ নির্মাণে অবহেলা– এসব কিছুই উঠে এসেছে চলচ্চিত্রটির মধ্য থেকে, যা তাদের নিয়ত অব্যাহত সামাজিক সংগ্রামে প্রভাব ফেলবে।

শ্রেণি চেতনার সামগ্রিকতার অনুপস্থিতি

চলচ্চিত্রটিতে মানুষের শ্রেণিচেতনার সামগ্রিক উপস্থাপন[১৩] দেখা যায় না। চলচ্চিত্রটির একটি দৃশ্যে চায়ের দোকানে কথোপকথনের সময়কালে আমরা গ্রামবাসীকে বলতে দেখি যে, 'হতদরিদ্র' আসলে কাকে বলা হবে? কেননা, যে ৫০ বিঘা জমি হারিয়েছে আর যে পাঁচ বিঘা জমি হারিয়েছে তারা সকলেই এখন এক। এমনকি চলচ্চিত্রের একটি ট্রেইলারেও দেখা যায় যে, বড় হরফে লেখা হয়েছে "We all became equal"। দুর্যোগকালীন সময়ে জৈবিক অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে মানুষের

নানাবিধ কর্মকাণ্ডে সাময়িকভাবে সংহতি ও সাম্যাবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ব্যক্তির দীর্ঘদিনের বয়ে চলা শ্রেণিগত চেতনা ক্ষণিক সময়েই অন্তর্হিত হয়ে যায় না। তার অর্থনৈতিক ভিত্তি প্রশ্নের সম্মুখীন হলেও পুরনো শ্রেণি চেতনার অনেক উপাদানই সে বয়ে চলে। সাইমন এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করে তাদেরকে যেন এক করে ফেলতে চাইছেন। এই যে মানুষের অন্তর্গত শ্রেণিগত চেতনার বহমান ধারা, তা ব্যক্তিমানসের কার্যক্রমে নানাভাবে প্রতিফলিত হয়। চায়ের দোকানের কথোপকথনে শ্রেণিদ্বন্দ্বের ইঙ্গিত থাকলেও সামগ্রিক রূপটি অনুপস্থিত। রাখী-সৌমেনের পারিপার্শ্বিকতার সাপেক্ষে তাদের শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের কোন প্রকট চিহ্ন চোখে পড়ে না। কিংবা সমাজের সদস্য হিসেবে বাকি সদস্যদের সাথে তাদের আন্তঃযোগাযোগের নজির ও তার ভেতওে বিদ্যমান নানা সংকটের কোনো চিহ্নও দেখা যায় না। বরং সামষ্টিক ঐক্য বিরাজ করে এমন কর্মকাণ্ডের প্রতিই কামার আহমাদ সাইমনের দৃষ্টি অধিক আকর্ষিত হয়। যেমন, বাঁধ নির্মাণের প্রচেষ্টা, গ্রামীণ বধূদের খুনসুটি, ফুটবল খেলা উপভোগ প্রভৃতি। রাখী-সৌমেন যখন সমাজের সদস্য হিসেবে অন্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় যাচ্ছে, তখন সেখানে শ্রেণিচেতনার সামগ্রিক রূপটি অনুপস্থিত।

পরিশেষ

কামার আহমাদ সাইমন 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রের মধ্য দিয়ে নির্মাণ বিষয়ক যে ধ্রুপদী আয়োজন নির্ভরতা, তা ভেঙে দিয়েছেন। চলচ্চিত্রটিকে পণ্যায়নের পথ থেকে গভীর দূরত্বে রেখে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছেন। চলচ্চিত্রের চরিত্রসমূহের ওপর কোন আখ্যান চাপিয়ে দেন নি। নিজেকে শিল্পের নিরাপদ দূরত্বে সামলে রেখেছেন, আর একই সাথে দূরে রেখেছেন তাঁর বিশ্বাস-বোধকে। চলচ্চিত্র নির্মাতা ভুক্তভোগীদের গল্প তাদের মতো করেই বলার পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন, যা নিম্নবর্গের মানুষকে দিয়েছে কথা বলার সুযোগ। ভাষারীতির দিক থেকেও স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। এমন ভাষারীতিই বেছে নিয়েছেন যা তাঁর বিষয়বস্তু ও ভাবের উপযোগী। চলচ্চিত্র আন্দোলনসমূহের নির্মাণশৈলী ও ভাষাগত পরম্পরা বজায় রেখে আঞ্চলিক অভিযোজন ঘটিয়েছেন। চলচ্চিত্রের ধরন (Genre)-এর চিন্তায় না থেকে নিজের মতো করে শৈলী নির্মাণ ও তার ব্যবহার করে গেছেন। চলচ্চিত্রটি কোথায় দাঁড়ালো, তার চাইতেও বড় কথা হয়ে দাঁড়ায়, চলচ্চিত্রটি কী উপস্থাপন করলো। তাই নির্দিষ্ট কোন ধরনে ফেলতে না পারাটা চলচ্চিত্রটির কোন ক্ষতিসাধন করতে পারে নি, বরং তার উৎকর্ষতার পরিমাপক স্বরূপ একটি 'অপ্রয়োজনীয়' বিতর্ককে উসকে দিয়েছে।

চলচ্চিত্রটিতে শ্রীয়মাণ স্বরে উপস্থিত থেকেও আবহের বড় ছায়া হিসেবে থেকেছে জলবায়ু পরিবর্তন ও এর পেছনের রাজনীতি। কম কার্বন নিঃসরণ করেও ক্রমাগত প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো, যাদের নেই সেই সংকট মোকাবিলার অর্থনৈতিক সক্ষমতা। অন্যদিকে, সবচেয়ে বেশি কার্বন নিঃসরণ করেও নিরাপদ রয়েছে উন্নত রাষ্ট্রগুলো। আর, এসব জটিল আবহের আন্তর্জাতিক রাজনীতির সীমারেখা থেকে বহু দূরে জীবন যাপন করেও অপরিমেয় দুর্দশার শিকার হতে হচ্ছে অনুন্নত-উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের নাগরিকদের। আঞ্চলিক দুর্দশা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে এই চলচ্চিত্রে বৈশ্বিক একটি সত্যকে সামনে এনেছেন পরিচালক কামার আহমাদ সাইমন। গ্রামের প্রান্তজনদের রাষ্ট্রকর্তৃক হেজিমনাইজড হওয়ার বিষয়টিও প্রতীকীভাবে চিত্রিত হয়েছে এখানে। কিন্তু চলচ্চিত্রটিতে পাওয়া যায় না এই অঞ্চলের ভুক্তভোগীদের শ্রেণি সচেতনতার বহিঃপ্রকাশ। নির্মাণশৈলীর আবহ আয়োজনে ও উপস্থাপনে কুশিলবদের স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে কামার আহমাদ সাইমন ভুক্তভোগীদের বক্তব্যের চলচ্চিত্রিক ভাষা প্রদান করেছেন। দর্শকদের কল্পনার মোহে আচ্ছন্ন না করে জানান দিতে চেয়েছেন বাস্তবতার। নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হয়ে সাইমন যেন তাই বিস্ময় প্রকাশ করে সবার প্রতি আহ্বান করে বলছেন, 'শুনতে কি পাও!'।

নোট

১. থিয়োডোর এডর্নো (১৯০৩-১৯৬৯) একজন জার্মান দার্শনিক ও সমাজবিজ্ঞানী। জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলকেন্দ্রিক যে তাত্ত্বিক মহল গড়ে উঠেছিলো, তিনি তাঁদের একজন। পশ্চিমা অনেক তাত্ত্বিক, যেমন গেয়র্গ লুকাচের মতো তিনিও মার্কসবাদের যে ধ্রুপদী অর্থনৈতিক নিয়তিবাদী (Economic Deterministic) ব্যাখ্যা, তা খারিজ করেন। প্রারম্ভিক মার্কসবাদের Alienation, Reification তত্ত্বগুলো গ্রহণ করে ক্রিটিক্যাল তত্ত্ব হিসেবে সেগুলোকে দাঁড় করান এবং সংস্কৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ করেন।

২. রোজা লুক্সেমবার্গ (১৮৭১-১৯১৯) একজন পোলিশ দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও বিপ্লবী। পোলিশ সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি ও যুদ্ধবিরোধী স্পার্টাকাস লীগের প্রতিষ্ঠাতা। গনতন্ত্র ও গণ-আন্দোলনের ওপর জোর দিয়ে লুক্সেমবার্গ মার্কসবাদের মানবতাবাদী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. আন্তোনিও ফ্রান্সেসকো গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) একজন ইতালিয়ান মার্কসবাদী দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ। ইতালির কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজনৈতিক তৎপরতার কারণে মুসোলিনির শাসনের সময় কারারুদ্ধ হন। তাঁর Cultural Hegemony তত্ত্ব চিন্তার জগতে একটি

গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। জেলে বসে লেখা তাঁর Prison Notebook রাজনৈতিক তত্ত্বের জগতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

৪. গেয়র্গ লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১) একজন হাঙ্গেরিয়ান মার্কসবাদী দার্শনিক, তাত্ত্বিক, সাহিত্য সমালোচক ও নন্দনতত্ত্ববিদ। তাঁকে পাশ্চাত্য মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়, যে ধারা সোভিয়েত ইউনিয়নের গোড়া মার্কসবাদী অবস্থান থেকে সরে এসে বিশ্লেষণাত্মক দিকে মনোযোগী হয়। কার্ল মার্ক্সের শ্রেণি সচেতনতার যে তত্ত্ব, সেটিকে তিনি আরো সমৃদ্ধ করেন। সাহিত্য সমালোচক হিসেবে বাস্তববাদী সাহিত্যিক ধারাকে আরো সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

৫. টেরেন্স ফ্রান্সিস ঈগলটন, যিনি টেরি ঈগলটন নামেই অধিক পরিচিত। একজন ব্রিটিশ মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচক। উত্তর-আধুনিকতাবাদের সমালোচনা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কাজের একটি। তাঁর বহুল পরিচিত গ্রন্থসমূহের একটি হলো Literary Theory: An Introduction (1983)।

৬. ইউজিন বের্টল্ট ফ্রেডরিখ ব্রেখট (১৮৯৮-১৯৫৬) একজন জার্মান নাট্যকার ও কবি। থিয়েটারের যে প্রথাগত মায়াময় (Illusionary) রীতি, তা ভেঙে এপিক (Epic) থিয়েটার নামে নতুন রীতির থিয়েটার চর্চা শুরু করেন। এই থিয়েটার চর্চা প্রবলভাবে মার্কসবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল এবং সামাজিক ও আদর্শিক উদ্দেশ্যেকে প্রধান ভেবে পরিচালিত হয়েছিল। ব্রেখট থিয়েটারে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রভাব' (Alienation Effect) নামে এক নতুন ধারণা যুক্ত করেন, যেখানে দর্শককে বার বার নাটক থেকে বিচ্ছিন্ন করে আবার যুক্ত করা হয়, যেন দর্শক নাটকের মোহময় জগতকে সত্যি বলে ভেবে না বসে।

৭. জর্জ ভ্যালেন্তিনোভিচ প্লেখানভ (১৮৫৬-১৯১৮) একজন রাশিয়ান বিপ্লবী, মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও দার্শনিক। তাঁকে রাশিয়ান মার্কসবাদের জনক বলা হয়, যদিও তিনি অক্টোবর বিপ্লবের একজন সমালোচক ছিলেন। তার বহুল প্রসিদ্ধ দুটি রচনা– *Socialism and Political Struggle* (1883) I *Our Differences* (1885), যেখানে তিনি পপুলিজমের (Narodnik) সমালোচনা করেন এবং রাশিয়ান মার্কসবাদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

৮. চলচ্চিত্র নির্মাণরীতির দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা প্রথা- সেট, কস্টিউম, প্রপস, লাইটিং এসবের সুশৃঙ্খল ও সুপরিমিত ব্যবহার। প্রথাগত চলচ্চিত্রে এসকল উপাদান নির্মাণরীতির অপরিহার্য অংশ হয়ে পড়ে। এসবের প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মান পরিচালকের অন্যতম উদ্বেগের বিষয়। নির্মাতাগণ চলচ্চিত্র নির্মাণব্যয়ের একটি বড় অংশ বরাদ্দ করেন এসব উপাদান ব্যবহারে। দর্শকের দৃশ্য-শ্রাব্য যন্ত্রকে তাঁরা কোনোভাবেই কষ্ট দিতে রাজি নন। তাই শব্দগ্রহণ ও চিত্রধারণের প্রযুক্তিগত মান চলচ্চিত্রের বক্তব্যের চাইতেও বড় বিষয় হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু 'শুনতে কি পাও!' চলচ্চিত্রটি তার বক্তব্য ও চিত্রিত বিষয়কেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছে, চিত্রায়নের উপাদানগুলোকে নয়।

৯. "The beliefs that imagination is superior to reason and devotion to beauty" (Morner, 1997), যুক্তির চাইতে কল্পনাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে যে শিল্প রচিত হয়। প্রকৃত ও সামগ্রিক বাস্তবতার চাইতে শিল্পীর আবেগতাড়িত কল্পনা যখন সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠে।

১০. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে ১৯৪০ ও ১৯৫০ এর মাঝামাঝি সময়ে এই চলচ্চিত্র আন্দোলনটি শুরু হয়। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে স্টুডিওগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও চলচ্চিত্রে অর্থবিনিয়োগে আসা পরিবর্তনের সাপেক্ষে চলচ্চিত্র আন্দোলনটির সূত্রপাত হয়। চলচ্চিত্রের বিষয় হিসেবেও সেসময় শ্রমজীবী ও দরিদ্র মানুষের জীবন ও সংকট চিত্রিত হতে থাকে। ধ্রুপদী হলিউডের বৃহৎ সেট, আকর্ষণীয় তারকা, মেলোড্রামাটিক আখ্যান-এর বিরুদ্ধ নির্মাণ নন্দনরীতি হিসেবে এই ধারা মেলোড্রামাবর্জিত সাধারণ জীবন আখ্যান, অপেশাদার অভিনয়শিল্পী ও অন-লোকেশন শুটিং এর পন্থাবলম্বন করে। ভিত্তোরিও ডি সিকার 'বাইসাইকেল থিভস' (১৯৪৮) ও লুকহিনো ভিস্কোন্তির 'লা তের্‌রা ত্রেমা' (১৯৪৮) এই আন্দোলনের দুটি বহুল পরিচিত চলচ্চিত্র।

১১. ১৯৫০-৬০ এর মাঝামাঝি সময়ে ফ্রান্সে চলচ্চিত্র আন্দোলনটির সূত্রপাত। নির্মাতাকে 'অথর' হিসেবে দেখা হয়। এতে মনে করা হয়, লেখক-চিত্রশিল্পী যেমন তাঁর লেখায়-আঁকায় নিজস্ব শৈলীর স্বাক্ষর রাখেন, তেমনি চলচ্চিত্র নির্মাতাও চলচ্চিত্রে ব্যক্তিগত অভিরুচির প্রকাশ ঘটাবেন। পরিচালক নির্মাণের সকল প্রক্রিয়াতেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকবেন। পুরো চলচ্চিত্রে পরিচালকের সৃজনশীল ভাবনার কর্তৃত্ব থাকবে। এই ধারার নির্মাতারা সম্পাদনা, দৃশ্যধারণ ও আখ্যান বর্ণনা প্রক্রিয়াতে নিরীক্ষণ ঘটিয়ে নতুন ধরনের আবির্ভাব ঘটান। বহনযোগ্য ও হালকা সরঞ্জাম (যেমন, ১৬ মি.মি. হ্যান্ডহেল্ড ক্যামেরা), লোকেশন সাউন্ড রেকর্ডিং, জাম্প কাট, লং টেক, চতুর্থ দেয়াল ভাঙ্গা, অসমান্তরাল আখ্যানপ্রবাহ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তারা চলচ্চিত্রের নির্মাণ ও ভাষায় যুক্ত করেন। ফ্রাসোয়া ত্রুফোর 'The 400 Blows' (১৯৫৯) ও জ্যঁ লুই গদারের 'Breathless' (১৯৬০) এ আন্দোলনের বহুল পরিচিত দুটি চলচ্চিত্র।

১২. ১৯৬০-৭০ মধ্যবর্তী সময়ে লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ায় উদ্ভূত একটি চলচ্চিত্র আন্দোলন। আর্জেন্টাইন পরিচালক ফারনান্দো সোলানাস ও অক্টাভিও গেটিনো রচিত ম্যানিফেস্টো 'Toward a Third Cinema' (১৯৬৯) থেকে চলচ্চিত্র আন্দোলনটির সূত্রপাত।য়েতে বি-

উপনিবেশায়ন ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভাবনা থেকে হলিউড ও ইউরোপের চলচ্চিত্রগুলোর আদর্শগত ও বাণিজ্যিক যে ভাবনা, তা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোর জন্য বিপ্লবী চলচ্চিত্র নির্মাণ পদ্ধতির প্রস্তাব করা হয়। 'অংশগ্রহণমূলক চলচ্চিত্রনির্মাণ' এর কথা বলা হয়, যেখানে পরিচালকসহ সকলের যৌথ অবদান থাকবে। এ ধারার পরিচালকরা আঞ্চলিক কাহিনী বর্ণনা পদ্ধতি, মৌখিক ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি, জনপ্রিয় সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়াদি চলচ্চিত্রে যুক্ত করার কথা বলেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও তারা বিকল্প ও জনসংযুক্ত প্রদর্শনীর প্রস্তাব করেন। এ ধারার বহুল পরিচিত দুটি চলচ্চিত্র হলো ফারনান্দো সোলানাস ও অক্টাভিও গেটিনো পরিচালিত 'The Hour of the Furnaces' (১৯৬৮) ও হোর্হে সানজিনেস পরিচালিত 'Blood of the Condor' (১৯৬৯)।

১৩. উদাহরণস্বরূপ, সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'অশনি সংকেত' (১৯৭৩) চলচ্চিত্রটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যা ৪৩'র মন্বন্তরের সময়ের একটি পরিবারের আখ্যানকে কেন্দ্র করে চিত্রায়িত। একটি দুর্যোগকালে চলচ্চিত্রটিতে মানবতাবাদের উত্থান উপস্থাপিত হলেও শ্রেণিচেতনার বিষয়টিও নানাবিধ সংকটের মাধ্যমে চিত্রিত হয়েছে। অর্থনৈতিক দৈন্যতায় গঙ্গাচরণ ও অনঙ্গকে নানাবিধ সংকটে পড়তে হয়। অনঙ্গ বাহ্মণ-স্ত্রী হওয়া স্বত্ত্বেও নিচুবর্ণের নারীদের সাথে অন্যের বাড়িতে কাজ করতে বাধ্য হয়। চালের সংকটকে কেন্দ্র করে গঙ্গাচরণের সামাজিক শ্রেণিগত অবস্থানের যে পরিবর্তন, তা বোঝা যায় বিশ্বাস মশাইয়ের সাথে সম্পর্কের উত্থান-পতন ও নিবারণ ঘোষের সাথে কথোপকথনে। এছাড়াও গ্রামের মানুষ চাল না পেয়ে বিশ্বাস মশাইকে জখম করতেও বাদ রাখে না। গ্রামের বউ ছুটকি চালের লোভে পালিয়ে যায় মুখপোড়া এক যুবকের সাথে। আবার, দুর্যোগ যে সামষ্টিক চেতনা সৃষ্টি করে তার উদাহরণও পাওয়া যায় গ্রামবাসীর চাল লুট এবং বিশ্বাস মশাইয়ের সাথে কথোপকথনে সকলের একত্রিত উপস্থিতি ও প্রতিবাদে। চলচ্চিত্রটিতে শ্রেণিচেতনার সামগ্রিক রূপটিকে উপস্থিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা

এই গবেষণাপ্রবন্ধটি রচনায় দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মাসউদ ইমরান মান্নু। সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

তথ্যসূত্র

Crehan, K. (2002). *Gramsci, Culture and Anthropology* (1st ed.). University of California Press.

Eagleton, T. (2008). *Literary Theory: An Introduction* (1st ed.). University of Minnesota Press.

Eagleton, T. (2006). *Marxism and Literary Criticism*. Taylor and Francis e-Library.

Eagleton, T., & Milne, D. (1996). *Marxist Literary Theory*. Blackwell.

Gabriel, T. H. (1979). *Third Cinema in The Third World: The Aesthetics of Liberation*. Umi Research Press.

Habib, M. A. R. (2005). *A History of Literary Criticism: From Plato to the Present* (1st ed.). Wiley-Blackwell.

Haq, F., & Shoesmith, B. (2023). *Identity, Nationhood and Bangladesh Independent Cinema*. Routledge.

Jahangirnagar Cine Society. (2020, December 16). *Kvgvi Avngv`mvBg‡bi mv‡_ AvÇv* [Video]. Facebook. https://t.ly/1OpFb

Islam, M. N., & Al-Amin, M. (2019). The Rampal Power Plant, Ecological Disasters and Environmental Resistance in Bangladesh. *International Journal of Environmental Studies*, *76*(6), 922–939. https://doi.org/10.1080/00207233.2019.1662183

Marx, K. (1982). *Capital: A Critique of Political Economy*. Penguin Books.

Morner, K., & Rausch, R. (1997). NTC's Dictionary of Literary Terms. NTC Publishing Group.

Selden, R., & Widdowson, P. (1993). *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*. Amsterdam University Press.

Simon, K. A. (Writer & Director). (2012). *Are You Listening!* [Film]. Studio Beginning

Wright, E., & Eagleton, T. (1976). *Marxism and Literary Criticism*. Routledge.

বিজয় দিবসে সাইমনের বহুল আলোচিত ছবি 'শুনতে কি পাও!. (2020, December 16). Cultural Yard. Retrieved August 3, 2022, from https://t.ly/qDQnP